

النصر
AN-NASR
আন নাসর মিডিয়া
আস সাহাব মিডিয়া

ইমামুল মুজাহিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ)
এর স্মৃতিচারণ

ইমামের সাথে অতিবাহিত দিনগুলো

(পর্ব-০৬)

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা

AN-NASR

-মূল প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য-

মূল নাম:

أيام مع الإمام (٦)

ভিডিও দৈর্ঘ্য: ৩১:২৮ মিনিট

প্রকাশের তারিখ: ১৪৩৫ হিজরি, ২০১৪ ঈসায়ী

প্রকাশক: আস সাহাব মিডিয়া

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه

বিশ্বের আনাচে কানাচে অবস্থানরত আমার মুসলিম ভাইয়েরা, আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

এটি ইমামের সাথে অতিবাহিত দিনগুলো সিরিজের (أيام مع الإمام)-এর ৬ষ্ঠ পর্ব। এ পর্বে আমি ইমামুল জিহাদ, মুজাদ্দিদ, যুগশ্রেষ্ঠ বীর শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র সাথে আমার আরো কিছু স্মৃতিচারণ করব। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন।

বিগত দুই পর্বে তোরাবোরা ও সেখানে কাটানো দিনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং শত্রু-মিত্র সম্পর্কেও কিছু কথা বলেছি। প্রথমে বন্ধু ও মিত্রদের নিয়ে আলোচনা করেছি। সেখানে শ্রদ্ধেয় শাইখ মুজাহিদ মুহাম্মাদ ইউনুস খালিস রহিমাহুল্লাহ, কারী আবদুল আহাদ রহিমাহুল্লাহ, মুয়াল্লিম আওয়াল গুল রহিমাহুল্লাহ এবং মৌলভি নুর মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ-কে নিয়ে অনেক স্মৃতিচারণ করেছি। আল্লাহ তাঁদের ওপর অবারিত রহমত বর্ষণ করুন।

গত পর্বগুলোর মতো এ পর্বেও শহীদদের নিয়ে স্মৃতিচারণ করব ইনশাআল্লাহ। আর যে সকল গাজি ভাই পর্যাপ্ত সাহায্য-সহযোগিতা করার পাশাপাশি আমাদেরকে অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধা করেছেন, আল্লাহ চান তো তাদের সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আমাদের প্রতি তাঁদের অনুগ্রহ এবং সদাচারের কথা কখনো ভুলব না। ভুলে যাব না জিহাদ ও জিহাদি আন্দোলনের জন্য তাঁদের অসামান্য খেদমত ও বিরাট অবদানের কথা। আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমি তাঁদের উদ্দেশ্যে বলব, আপনারা আমাদের চোখের মণি, আমাদের সেরেতাজ, আপনাদের অনুগ্রহের কথা কখনো বিস্মৃত হবে না। ইনশাআল্লাহ, অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন আল্লাহর ইচ্ছায় আপনাদের নিয়ে মনভরে আলোচনা করব।

বন্ধুবর ও প্রিয় সাথীদের আলোচনা শেষে এখন তোরাবোরার শহীদদের সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করব এবং সে শহীদদের নিয়েও আলোচনা করব, যারা তোরাবোরা যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে শাহাদত বরণ করেছেন।

মূল আলোচনায় আসি। শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র পরিকল্পনা এবং সুড়ঙ্গ খননে তাঁর প্লান ও দক্ষতার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করছি। বাঙ্কার ও সুড়ঙ্গের কল্যাণে আল্লাহর ইচ্ছায় ভাইদের মাঝে হতাহতের সংখ্যা অনেক কম ছিল। কারণ ভাইদের হতাহতের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে শতকরা দশ বা বারো-তেরোজন পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তোরাবোরায় ভাইয়েরা যে ভয়াবহ বোমাবৃষ্টির মাঝে পড়েছিলেন এবং নির্দয় অবরোধে ফেঁসে গিয়ে যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেই তুলনায় হতাহতের এ সংখ্যা ছিল অত্যান্ত নগণ্য।

বাঙ্কার ও সুড়ঙ্গ খননের ব্যাপারে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র দক্ষতা ছিল অসাধারণ। এটি এমনই এক সূক্ষ্ম রাজনৈতিক পদক্ষেপ, যা প্রত্যেক অঞ্চলের মুজাহিদ ভাইদের অনুসরণ করা উচিত। কেননা, জায়নবাদী ক্রুসেডাররা আমাদের সাথে আকাশপথের কর্তৃত্ব আর ক্ষমতার দাপট দেখায়। এই বাঙ্কার ও সুড়ঙ্গ আকাশপথের কর্তৃত্বের মোকাবেলায় বেশ উপযুক্ত একটি পন্থা। তাই আমার জোর নির্দেশ হচ্ছে, প্রত্যেক সেক্টরের মুজাহিদ ভাইগণ বাঙ্কার ও সুড়ঙ্গ খননে বিশেষ গুরুত্ব দেবেন এবং এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব ও সৃজনশীলতা অর্জন করবেন। তাহলে আল্লাহ চান তো, শত্রুর আকাশপথে হামলার আশঙ্কা অনেক কমে আসবে।

এখন যে সকল শুহাদার আলোচনা শুরু করব, তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি বীর মুজাহিদ, শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ'র কথা উল্লেখ করব। জিহাদি আন্দোলনের ইতিহাসে এই মহান মানুষটি সুদৃঢ় পর্বততুল্য। তিনি রুশ-বিরোধী জিহাদের সময় থেকেই জীবনের পুরো সময় জিহাদের খেদমতে ওয়াকফ করে দিয়েছেন। জিহাদি আন্দোলন এবং মুজাহিদ ভাইদের জন্য কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই নিজের সর্বোচ্চ কোরবানি পেশ করেছেন। অবশেষে আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে আমি পূর্বেও বলেছি। তাঁর ব্যাপারে শাইখ উসামার প্রশংসার কথাও উল্লেখ করেছি। কিন্তু এখন তোরাবোরার বীরদের সঙ্গে তাঁর আলোচনাও উল্লেখ করব।

তিনি এবং খালদুন ক্যাম্পের তাঁর অন্যান্য সাথীরা ছিলেন একটি বিদ্যাপীঠের মতো। তাঁদের এই ক্যাম্প ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়। যখন রাশিয়া আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যায়, জিহাদি দলগুলো আন্তঃদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অনেক মুজাহিদ আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যায়, তখন শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ ও তাঁর সাথীদের কর্মতৎপরতা হয়ে যায় আফগানিস্তানে থেকে আফগান ভূমিকে সকল জিহাদি জামাআতের মুজাহিদ ভাইদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা। তাঁদের এই বরকতময় কাজ জিহাদের ময়দানগুলোতে অনেক সুফল বয়ে আনে। তাঁদের খালদুন ক্যাম্প শুধু প্রশিক্ষণ শিবিরই ছিল না, বরং তাঁরা সেখানে একটি স্বতন্ত্র দাওয়াহ বিভাগ চালু করেছিলেন, যেখানে দরস দিতেন শাইখ আবু আবদুল্লাহ আল-মুহাজির হাফিজাহুল্লাহর মতো ব্যক্তি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অচিরেই তাঁর সাথে একত্রিত করুন। শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি যেমনিভাবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পথে একজন উৎসর্গিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তেমনিভাবে ছিলেন এই মাদরাসার অগ্রদূত। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহয় যেমন নিবেদিত প্রাণ ছিলেন, তেমন কঠিন দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ছিলেন দৃঢ়তার এক আদর্শ পুরুষ। সামনে তাঁর যুদ্ধসংক্রান্ত অভিজ্ঞতার কথা আলোচনায় আসবে ইনশাআল্লাহ। তিনি অত্যন্ত পারদর্শী যোদ্ধা ছিলেন। তোরাবোরায় সামরিক কমান্ডার ছিলেন। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বল্প সরঞ্জাম নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

প্রথমে আমি শাইখের দৃঢ়তার কথা আলোচনা করব এবং দৃঢ়তার উদাহরণস্বরূপ দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরব। এর মধ্যে একটি পূর্বেও বলেছিলাম। তা হলো, তিনি এবং অন্যান্য মুজাহিদ ভাইয়েরা অবরোধ থেকে মুক্ত হয়ে নিরাপদে পাকিস্তানে সরে যেতে সক্ষম হলেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে গেলেন। সেখানে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে বন্দি হলেন। পাকিস্তানের নিরাপদ এলাকায় পৌঁছার পরে সেখানের এক কবিলা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের হাতে তুলে দেয়।

অথচ তোরাবোরায় কঠিন অবরোধ এবং অনবরত বোমা বর্ষণ সত্ত্বেও আমেরিকা সেখানে কিছুই করতে পারেনি। অতঃপর যখন তাঁরা তোরাবোরা থেকে বের হয়ে নিরাপদে পাকিস্তানে চলে গেলেন। সেখানকার গোত্রগুলো গোত্রের নীতি অনুযায়ী তাঁদেরকে নিরাপত্তা দিল আর তাঁরাও এতে আশ্বস্ত হলেন। তখন পাকিস্তান সরকার

বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপ্রত্যাশিতভাবে এসে ভাইদের ঘেরাও করে এবং তাঁদেরকে বন্দি করে। 'কুহাত' জেলে—যে কথা আমি আগেও বলেছি—পাকিস্তানি প্রতারক অফিসাররা শাইখের সাথে দরকষাকষির চেষ্টা করে। তারা চাইছিল শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবির সাথে থাকা অর্থগুলো ছলে বলে কৌশলে নিয়ে যাবে। অন্যান্য সাথীদের দেখাশোনা ও পরিচালনার জন্য শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ তাঁকে বেশ কিছু অর্থ দিয়েছিলেন। সেগুলো তাঁর সাথেই ছিল। (তোরাবোরা থেকে বের হওয়ার ঘটনা আলোচনা করার সময় বিষয়টি বিস্তারিত তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ)। এ অফিসাররা তাঁর কাছ থেকে এগুলো বাগিয়ে নিতে চাইছিল। ফলে তারা এভাবে দরকষাকষি শুরু করল যে, আমরা আপনাকে এই সমস্যা থেকে বের করে দেবো এবং পলায়নের ব্যবস্থা করে দেবো। তবে শর্ত হলো এই অর্থগুলো আমাদেরকে দিয়ে দিতে হবে। পুরো ঘটনাটি এমনভাবে আমরা করব, যেন আপনাকে আমরা বন্দিই করিনি। শাইখ রহিমাহুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন) এই সংকটময় মুহূর্তে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে এই সম্পদের দ্বিগুণ সম্পদ দেবো। যদি আমার সাথে আমার সকল ভাইকে ছেড়ে দাও। শুধু আমাকে ছাড়লে হবে না।' উত্তরে তারা বলল, 'না! এই প্রস্তাব গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি না।' অবশেষে তিনি ভাইদের সাথেই জেলে থেকে গেলেন। কী অতুলনীয় সেনাপতি তিনি! কত উত্তম আদর্শবান ব্যক্তি!!

শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ'র সুউচ্চ মনোবল এবং দৃঢ়তার আরেকটি দৃষ্টান্ত। আবু ইয়াহইয়া রহিমাহুল্লাহ এই ঘটনাটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দুজনেই বন্দি হওয়ার পর আফগানিস্তানের একটি কারাগারে ছিলেন। তো আবু ইয়াহইয়া রহিমাহুল্লাহ আমাকে বললেন, 'যখন আমেরিকার তদন্তকারীরা তাকে জিজ্ঞেস করল যে, "আপনি কি আল-কায়েদার সদস্য?" অবশ্য শাইখ রহিমাহুল্লাহ আল-কায়েদার সদস্য ছিলেন না। তিনি উসামা বিন লাদেনের কাছে বাইয়াতপ্রাপ্ত ছিলেন না। আমি আগেও বলেছি, শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন বিস্ময়কর মানুষ। তিনি ইসলামি ও জিহাদি দলগুলোর সদস্যদের কাজে লাগাতেন, চাই তারা তাঁকে বাইয়াত দিক বা না দিক। শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ'র মর্যাদা ও মহৎ গুণাবলির আলোচনায় বলেছিলাম, তিনি পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। ইসলামি দলগুলো থেকে সর্বাত্মকভাবে দ্বীনের খেদমত নিতেন।

তানজীমি বা সাংগঠনিকভাবে তাদের যোগদান করা ছাড়াই বিভিন্ন কাজ দিয়ে রাখতেন। শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ চুম্বকের মতো সকলকে একত্র করে বিভিন্ন ফলপ্রসূ প্রকল্পে লাগিয়ে রাখতেন। শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ আল-কায়েদাতে ছিলেন না। কেননা, তখন তিনি শাইখ উসামার কাছে তখনো বাইয়াতপ্রাপ্ত নন। যাই হোক, তদন্তকারীরা যখন বলল, 'আপনি কি আল-কায়েদার সদস্য?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আমি আল-কায়েদার সাথেই আছি।' শাইখ আবু ইয়াহইয়া রহিমাহুল্লাহ তাঁকে বললেন, 'আপনি তো নিজেকে জটিলতায় ফেলে দিয়েছেন!' তিনি বললেন, 'না। তাদের সামনে আমি আল-কায়দা থেকে আলাদা হতে চাইনি। আল-কায়েদা হলো সম্মান ও মর্যাদার অপর নাম। আল-কায়েদা থেকে আমি আলাদা হবো না। আমি তাদের সামনে ভীত হবো না। আমি আল-কায়েদার সাথে না থাকলেও আল-কায়েদাকে নিয়ে গর্ব করি।' শাইখের আলোচনা এই পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আর তোরাবোরা যুদ্ধে শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি'র অংশগ্রহণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলব।

শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ ছিলেন তোরাবোরার সামরিক কমান্ডার। তাঁর সাথে ছিল অল্প কিছু সরঞ্জাম, যা এই ক্রুসেডার জোটের সামনে উল্লেখ করার মতো নয়। আমরা দেখেছি, ফ্রান্সের ডাসাল্ট মিরেজ এবং আমেরিকার বি৫২ বিমানসহ বিভিন্ন জঙ্গি বিমান কীভাবে তোরাবোরায় বোম্বিং করেছে। সেগুলো একের পর এক তোরাবোরাতে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছিল। সে সময় আফগান-যুদ্ধ প্রায় শেষ পর্যায়েই ছিল। তোরাবোরা ছাড়া আর কিছুই ধ্বংস করার মতো ছিল না। পুরো বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তোরাবোরার দিকে। সংবাদ সংস্থাগুলো তোরাবোরার বাইরে অপেক্ষমাণ ছিল। আর এদিকে আরব মুজাহিদরা কেউ বন্দি হচ্ছিল আর কেউ নিহত হচ্ছিল। বুশ ভেবেছিল, যদি তোরাবোরার এই স্বল্প সংখ্যক মুজাহিদদেরকে এবং শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ-কে ধরে ফেলতে পারে, তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে এবং তারা আফগান-যুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে পারবে। এরপর ইরাক-যুদ্ধের দিকে মনোনিবেশ করবে। সারা পৃথিবী অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিল যে, ঘটনা কোন দিকে মোড় নেয়! কারণ, সমগ্র খ্রিষ্টানজোট একত্রে তোরাবোরায় হামলারত ছিল। তো, শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ'র সাথে অল্প কিছু সরঞ্জাম ছিল। অন্যান্য মুজাহিদ ভাইদের কাছে

ছিল হালকা কিছু অস্ত্র। তবে একটি গোপন তথ্য প্রকাশ করছি, তোরাবোরায় ভাইদের সাথে যে অস্ত্র ছিল, সেটা কেবল একটি মর্টার মাত্র—এই বিশাল বাহিনীর মোকাবেলায়। কীভাবে যে বলব? অর্থাৎ একদিকে অস্ত্রের পাহাড়, বিপুল যুদ্ধ সরঞ্জাম, বিমানের বহর, বিশাল সৈন্যবহর। যারা মুহূর্তের মধ্যে তোরাবোরা পাহাড়কে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চাচ্ছে। এই একটি মর্টার গান দিয়ে, হ্যাঁ, শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ এই একটি মাত্র মর্টার দিয়েই তোরাবোরা অভিমুখে মুনাফিকদের অগ্রযাত্রা রুখে দিয়েছিলেন।

আমি পূর্বেও বলেছি, মার্কিনিরা চূড়ান্ত পর্যায়ের ভীরু এবং কাপুরুষ। তারা এতটাই ভীতু যে, তোরাবোরায় নিজেরা হামলা করার দুঃসাহস করতে পারেনি। তারা বুঝতে পেরেছিল, যারা তোরাবোরায় অবস্থান করছে, তাঁরা বুকে প্রাণ থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ করার সংকল্প করেছে। ফলে তারা নিজেরা সাহস না করে মুনাফিক বাহিনীগুলোকে এগিয়ে দিচ্ছিল। যখনই মুনাফিকদের একটি ব্যাটেলিয়ানকে লড়াইয়ের জন্য অগ্রে পাঠাত, তখনই তাদের অধিকাংশ লাশ হয়ে যেত এবং বাকিরা আহত হয়ে ফিরে যেত। এভাবে তারা আসছিল আর লাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা তোরাবোরাতে আক্রমণকারী এ সকল মুনাফিকের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। (ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে পরবর্তী সময়ে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা উল্লেখ করব।)

শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রথমে তাঁর ফায়ার পয়েন্টসমূহ, মেশিনগানগুলো এবং মর্টারটি শত্রুদের থেকে আড়াল করে রেখেছিলেন। যে বিমানগুলো দীর্ঘ ১৪ দিন ধরে তোরাবোরায় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছিল, সেগুলো থেকে ফায়ার পয়েন্টগুলো গোপন করে রেখেছিলেন। যখনই মুনাফিকদের কোনো ব্যাটেলিয়ান এগিয়ে আসত, তখনই তারা মুজাহিদদের গোপন ফায়ার পয়েন্টের আওতায় পড়ে যেত। ফলে তারা লাশ কিংবা আহত হয়ে ফিরে যেত। তারপর অন্য একটি ব্যাটেলিয়ান গ্রুপ বোমা ফেলতে ফেলতে সামনে এগিয়ে আসত। এত পরিমাণে বোমা নিক্ষেপ করত যে, তারা ধারণা করে নিত, প্রতিরোধকারী মুজাহিদদের শেষ করে ফেলেছে। তারপর অন্য একটি মুনাফিকদল আসত। শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ ও তাঁর সাথীরা তাদের প্রতিহত করতেন। এভাবেই তোরাবোরার যুদ্ধ চলতে থাকে। অবশেষে মুজাহিদরা তোরাবোরা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন।

আল্লাহ তাআলা শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ-কে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি ধৈর্য, অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মুনাফিকদের প্রত্যেক হামলার জবাব দিয়েছিলেন।

আমি পূর্বেও বলেছি যে, শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ অঙ্গীকার পূরণে ছিলেন একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ। সম্ভবত এই পর্বগুলোতে আমি শাইখ উসামার সাথে তাঁর ওয়াদা পূরণের কথা উল্লেখ করেছিলাম। একবার প্রায় একশজনের মতো মুনাফিক এক উপত্যকায় ভাইদের রেঞ্জের ভেতরে চলে আসে। কিন্তু মুনাফিকরা তাদের কাছে নিরাপত্তা চায়। শাইখের সাথীরা মুনাফিকদের হত্যা করতে যাবেন, এমন সময় শাইখ তাদের হত্যা করতে নিষেধ করে দেন। কেননা, শাইখ তাদের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। এটি ছিল শাইখের যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অন্যতম প্রমাণ। এমন পরিস্থিতিতে সাথীদের তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলেন।

তোরাবোরার একটি মজার ঘটনা হলো, ভাইয়েরা সংবাদ বিনিময়ের সময় এই মর্টারটিকে খচ্চর বলে উল্লেখ করতেন। একদিন এক ভাই শাইখকে ডেকে বলছিল, ‘হে ইবনুশ শাইখ, হে ইবনুশ শাইখ! খচ্চরের তো খাবার শেষ হয়ে গেছে।’ শাইখ বললেন, ‘চুপ করো। কথা বলো না।’ ভাইটির কথার অর্থ ছিল, ‘মর্টারের গোলা-বারুদ শেষ হয়ে গেছে।’

আলহামদুলিল্লাহ, চিন্তা করুন। এই সামান্য যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিয়েই অল্প কিছু মুজাহিদ—যাদের সংখ্যা প্রায় ৩০০ জনের মতো—তারা বিশ্বের সুপারপাওয়ারের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন! হ্যাঁ, আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্তে বিজয়ী হবেনই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বুঝতে পারে না।

এ ঘটনায় একটি শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এই দাম্ভিক ও অহংকারী শক্তির সামনে নির্ভীক চিত্তে টিকে থাকলে বিজয় আসবেই। কারণ, বাতিল শক্তি তো হচ্ছে সর্বোচ্চ কিছু দুনিয়াবি সরঞ্জাম আর এমন কিছু মানুষ, যারা ভীতু এবং নিজের জীবনের ভিখারী। অপরদিকে যদি তুমি নিজেকে আল্লাহর হুকুমের সামনে সোপর্দ করো এবং আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে তারা তোমার সাথে কিই-বা করবে? কিছুই করতে পারবে না। সর্বোচ্চ তোমাকে হত্যাই করতে পারবে।

হাস্যকর বিষয় হলো, ‘ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, পেনসিলভানিয়ার বরকতময় হামলাগুলো যখন সংঘটিত হলো, তখন আমেরিকা বরাবরের মতো এবারও এ হামলাগুলোকে বেসামরিক লোকদের বিরুদ্ধে বলে প্রচার করেছিল। সে সময় ওয়াশিংটনে অবস্থিত তাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগনেও হামলা হয়েছিল। কিন্তু সেই কথা তারা উল্লেখ করেনি। আল্লাহর রহমতে এই মোবারক হামলায় বিশ্বের প্রধান সামরিক কেন্দ্রস্থলকেও ধ্বংস করা হয়েছিল।

প্রিয় ভাই, বীর শহীদ তারেক আনোয়ার রহিমাহুল্লাহ’র কথা বলছি। এই হামলার পর কাবুলে তিনি আমাকে বললেন, ‘শাইখ, আমেরিকা এখন আমাদের সাথে কী আচরণ করবে?’ আমি বললাম, ‘আল্লাহর কসম! তারা তা-ই করবে, যা তারা আগে থেকে করে আসছে। কিন্তু তারা যা-ই করুক, তাতে আমাদের কিই-বা ক্ষতি করতে পারবে?’ তিনি বললেন, ‘তারা আমাদের ওপর পারমাণবিক বোমা ফেলবে! আমরা তখন কী করব?!’ আমি বললাম, ‘আমরা কী করব! সর্বোচ্চ এটাই হবে যে, আমরা মরে যাব।’ তিনি বললেন, ‘আপনি ঠিক বলেছেন।’ এরপর হেসে দিয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ, আমরা মরে যাব। কারণ মুমিনের কাছে জীবন আর মৃত্যু দুটোই সমান। সবার একটাই উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। মৃত্যু কখন আসবে আর কখন আসবে না এটা তার ভাববার বিষয় নয়। এটা তার কাজও নয়। তার কাজ হলো, একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে খুশি করা।’ তোরাবোরায় এই শিক্ষাটাই স্পষ্টভাবে অর্জন হয়েছে।

যাই হোক, আমরা খচ্চর ও তার খাবারের গল্পে ফিরে যাই। এই সাধারণ কিছু অস্ত্র নিয়েই শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ মুনাফিক আর খ্রিষ্টানদের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

তোরাবোরার পরে শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানে বন্দি হলেন। আফগানিস্তানের বিভিন্ন জেলে বহু দিন পর্যন্ত বন্দি থাকেন। অতঃপর আরো বেশি টর্চার করার জন্য ওরা শাইখকে একটি কফিনে করে মিসরে নিয়ে যায়। মিসরের ক্ষমতার মসনদে তখন উমর সুলায়মান নামের কুকুর শাসক ছিল। আল্লাহ তাকে তার প্রাপ্য অনুযায়ী শাস্তি দান করুন। শাইখকে সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সেলে নিয়ে নির্যাতন করে তারা। তিনি সেখানে নির্যাতনের ঘটনাগুলো শাইখ আবু ইয়াহইয়া লিবির কাছে বর্ণনা করেন। মিসরীরা শাইখের কাছে এমন কিছু তথ্য চাচ্ছিল, যা দিয়ে

তারা আমেরিকাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে। তারা শাইখকে রাসায়নিক অস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। অথচ আমাদের কাছে কোনো রাসায়নিক অস্ত্র ছিল না। তাদের নির্যাতনের চাপে পড়ে শাইখ বলেছেন যে, ‘আমাদের কাছে রাসায়নিক অস্ত্র আছে।’ হ্যাঁ, তাদেরকে খুশি করার জন্য তিনি এমনই বলেছিলেন। তারা যেমন তথ্য চেয়েছিল, শাইখ তাদেরকে তেমনই তথ্য দিয়েছিলেন। যাতে তারা শাইখের ওপর নির্যাতন বন্ধ করে। এমন একটি তথ্য পেয়ে তারা খবরটা খুব প্রচার করতে লাগল। অপরদিকে আমেরিকা মিসরীদের ওপর খুশি হয়ে গেল এবং পুরো বিশ্বে এ খবর ফলাও করে প্রচার করল। তারা প্রচার করল, আল-কায়েদার কাছে রাসায়নিক অস্ত্রসহ আরো অনেক অস্ত্র আছে। তাদের ওপর হামলার সময় আমরা তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি।

মিসর প্রশাসন ছেড়ে দিলে তাঁকে আমেরিকার কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা তাঁকে রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ‘আমাদের কাছে কোনো রাসায়নিক বা এ জাতীয় বড় কোনো অস্ত্র নেই। সেখানে আমার ওপর তারা অত্যাচার করছিল। আমার থেকে এমন একটি স্বীকারোক্তি আদায় করতে চাপ প্রয়োগ করছিল। তাই তাদের চাহিদা অনুযায়ী এই কথাটি বলেছিলাম।’ এই ঘটনাটি ছিল বুশ প্রশাসনের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত করুন।

তারপর আমেরিকা শাইখকে লিবিয়ার কারাগারে স্থানান্তর করে। তারা দাবি করত যে, শাইখ ও তার সাথীরা গাদ্দাফির শত্রু। তাঁরা লিবিয়াকে গাদ্দাফির দখল থেকে মুক্ত করতে চায়। ওরা ছিল গাদ্দাফির মিত্র। লিবিয়ার কারাগারে অবস্থানকালে একটি মানবাধিকার সংস্থা শাইখের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। আমার ধারণামতে সেটি হয়তো ‘হিউম্যান রাইটস ওয়াচ’ই হবে। তারা এসে বলে, ‘আমরা আসলে আপনার ওপর ওদের নির্যাতনের ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য এসেছি। আমেরিকা ও লিবিয়ার কারাগারে আপনি কী কী নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন?’ তিনি তাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিরস্কারের সুরে বললেন, ‘আপনারা এখন এসেছেন?! আমার ওপর সব ধরনের নির্যাতন করার পর আপনাদের আসার সময় হলো! এখন নির্যাতনের কথা জিজ্ঞেস করার সময় হলো! চলে যান আপনারা! আপনাদের কাছে আমি কিছুই চাই না।’

শাইখ ইবনুশ শাইখ আল-লিবি রহিমাহুল্লাহ-কে লিবিয়ার কারাগারে শহীদ করা হয়। ধারণা করা হয়, তাকে শহীদ করার কারণ হলো, গাদ্দাফি তাঁর ওপর যেসব দোষ চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, তিনি সেগুলো মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। আল্লাহ শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি'র ওপর রহম করুন। তিনি জিহাদের ইতিহাসে লিবিয়া এবং মুসলিম বিশ্বে সুউচ্চ ও সুদৃঢ় পর্বততুল্য একজন বীর ছিলেন।

শাইখের সম্পর্কে যে কথা বলে আমি শেষ করতে চাই তা হলো, শাইখের এই রক্ত বিশেষ করে লিবিয়ার ভাইদের কাছে আর ব্যাপকভাবে সকল মুসলিমের কাছে আমানত। শাইখ ইবনুশ শাইখ আল-লিবি, শাইখ ইয়াহইয়া আল-লিবি, শাইখ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবি রহিমাহুল্লাহ-সহ তাগুতের হাতে শহীদ হওয়া অন্যান্য সকল মুজাহিদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার দায়িত্ব আমি লিবিয়ার ভাইদের ওপর অর্পণ করছি। এটা সর্বপ্রথম আপনাদের কাছে একটি পবিত্র আমানত। তারপর সকল মুসলিম ও মুজাহিদদের কাছে আমানত। সুতরাং আপনাদের কর্তব্য এ বীরসেনানীদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়া।

শাইখ ইবনুশ শাইখ আল-লিবি রহিমাহুল্লাহ-ই কেবল একমাত্র শহীদ নন বরং তাঁর সাথে থাকা তোরাবোরার ভাইদের মধ্যে শতকরা দশ থেকে বারো জন শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তাদের অধিকাংশই সেখান থেকে সরে আসার সময় শহীদ হন। তোরাবোরা থেকে বের হওয়ার সময় একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় তাঁরা অপেক্ষমাণ মার্কিন বিমানের বোমার শিকার হন। সেখানে প্রায় বিশ থেকে ত্রিশ জনের মতো শহীদ হন। আর তোরাবোরাতে আক্রমণের ফলে সেখানে প্রায় দশ জন মুজাহিদ শহীদ হন। উভয়টি মিলিয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় সর্বমোট শহীদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৩০-৪০ জনের মতো। আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁদের সাথে জান্নাতুল ফিরদাউসের উঁচু মাকামে একত্রিত করেন।

এই ঘটনায় শতকরা দশ থেকে বারো জনের মতো মুজাহিদ শহীদ হওয়া অত্যন্ত বড় একটি বিষয়। এটি সাধারণ কোনো বিষয় নয়। যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন হলেন, শহীদ আবু মিহজান রহিমাহুল্লাহ। তিনি আফগানে, বসনিয়ায় এবং তালেবানের শাসনামলে ইমারাতে ইসলামিয়ার পক্ষে জিহাদ করেন। অবশেষে তোরাবোরাতে শহীদ হন। আরেকজন হলেন, শহীদ মুহাম্মাদ মাহমুদ আল-মাক্কি রহিমাহুল্লাহ। ইতিপূর্বে তিনি বসনিয়ায় জিহাদ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে আফগান

জিহাদে শরীক হন এবং তোরাবোরাতে বোমা হামলার প্রথম পর্যায়ে শহীদ হন। আমি যখন তোরাবোরাতে উঠছিলাম, তখন তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে সময় তিনি একটি পয়েন্টের আমীর ছিলেন।

তোরাবোরায় ভাইয়েরা কেমন সময় অতিবাহিত করছিল এবং কতটা সংকীর্ণ অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলেন, তা আপনাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরব। যখন তোরাবোরাতে উঠি, তখন সেখানকার কঠিন অবস্থার কথা আমাদের জানা ছিল না। এক ভাই অযু করার জন্য পানির কাছে আসলেন এবং খুব ভালোভাবে অযু সম্পন্ন করলেন। তখন শাইখ মুহাম্মাদ মাহমুদ আল-মাক্কি রহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন, ‘ভাই, আপনাকে আল্লাহ হিদায়াত দিন। এখানে পানি স্বর্ণতুল্য।’ তাঁর এই কথা থেকে আমরা বুঝে গেছি যে, ভাইয়েরা সেখানে কীভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন! সেই চিত্রটি তো স্বচক্ষেই দেখতে পেলাম। সেখানে পানির কদর স্বর্ণের চেয়েও বেশি ছিল। এটাই সেখানকার প্রকৃত অবস্থা।

ভাই তালুত রহিমাহুল্লাহ’র কথাও মনে পড়ছে আমার। এ ছাড়াও ভাই আবু ইয়াহইয়া আল-হাউন-এর কথাও মনে পড়ছে। তিনি একেবারে প্রথম দিকে তোরাবোরায় অংশগ্রহণ করেন। তারপর সেখান থেকে চলে যান। (আল-হাউন অর্থ মর্টার) শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-হাউন রহিমাহুল্লাহ নাম অনুযায়ী মর্টারের ওপর বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন।

যারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, ইমারাতে ইসলামিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিল, তারা শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-হাউনকে ভালো করেই চিনেন। তিনি খালদুনের বরকতময় মাদরাসার একজন অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন গুমনাম আল্লাহভীরু ব্যক্তি। তিনি সেই মহান ব্যক্তিদের একজন ছিলেন, যারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য কাজ করে যান, কারো পুরস্কার বা প্রশংসার আশা করেন না। তারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করেন। তিনি শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ’র বন্ধু ছিলেন। আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ কৌতুক করে তাঁকে ইতালির শত্রু বলে ডাকতেন। কারণ তিনি একসময় ইতালিতে কাজ করতেন। তারপর ইতালি থেকে চলে আসেন এবং আফগানিস্তানে হিজরত করে জিহাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। তাঁর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি সময়ের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতেন।

আমরা তাকে দেখতাম, হয়তো তিনি জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত আছেন, অথবা কোনো আমলে মশগুল আছেন। তিনি আফগানিস্তানে খালদুন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের একজন প্রশিক্ষক ছিলেন। একই সময়ে তিনি শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আল-মুহাজিরের পরিচালিত দাওয়াহ্ ইনস্টিটিউটের একজন ছাত্রও ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে বিজয়ী বেশে নিরাপদে একত্রিত করুন, ইনশাআল্লাহ্।

যখন বরকতময় হামলাগুলোর পর আফগানিস্তানে ক্রুসেড জোট হামলা শুরু করল, তখন শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-হাউন রহিমাহুল্লাহ গোত্রীয় অঞ্চলে চলে গেলেন এবং সেখানে নতুন উদ্যমে মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন। যেহেতু তিনি মর্টার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাই সেখানে বিশেষভাবে তিনি মর্টারের প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন। শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-হাউন রহিমাহুল্লাহ অত্যন্ত আল্লাহভীরু ছিলেন। তিনি সর্বদা এই আশঙ্কা করতেন যে, তাঁর কাছে কেউ মর্টার চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়ে দুনিয়ার কাজে ব্যবহার করবে না তো! তিনি বিভিন্ন গোত্রের অবস্থা সম্পর্কে জানতেন। তাদের আত্মকলহ, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও হানাহানির কথা জানতেন। তাই প্রশিক্ষণ দানের আগে প্রত্যেকের কাছ থেকে কুরআনের ওপর হাত রেখে ওয়াদা নিতেন যে, তারা এই বিদ্যা একমাত্র জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজেই ব্যবহার করবে। এ প্রশিক্ষণ কেবল মুসলিমদের চির শত্রু কাফেরদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। বিভিন্ন গোত্রের আনসার ভাইয়েরা শাইখের সাথে মজা করে কৃত্রিমভাবে তাঁর সামনে গুপ্তচর সাজার চেষ্টা করতেন। কিংবা তাঁর নথিপত্রের দিকে তাকানোর চেষ্টা করতেন। তো শাইখ রহিমাহুল্লাহ্ তাদের সামনে তখন নথিপত্রের খাতা বন্ধ করে দিতেন।

শাইখ রহিমাহুল্লাহ্ এভাবেই মৃত্যু পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নীরবে-নিভৃতে কাজ করে গেছেন। তিনি জাইগোমেটিক হাড়ে ক্যান্সারের কারণে মারা যান। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তাঁকে নেককার লোকদের মাঝে কবুল করে নেন।

তোরাবোরার শহীদদের মধ্যে আরেক ভাই হলেন, ‘শাইখ হামযা আদ-দানদানি রহিমাহুল্লাহ।’ তিনি হারামাইনের ভূমিতে সৌদি পরিবারের হাতে শহীদ হন। তখন জাযিরাতুল আরবে মুজহিদদের মাঝে এবং বিশ্বাসঘাতক সৌদি বাহিনীর মাঝে যুদ্ধ চলছিল। আর শহীদ শাইখ হামযা আদ-দানদানি রহিমাহুল্লাহ্ ছিলেন তোরাবোরাতে

নতুন কিছু মুজাহিদ ভাইদের সমন্বয়ে গঠিত এক মাজমুআর আমীর। আর এ মাজমুআটি যুদ্ধের মধ্যে সুশৃঙ্খলতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার দিক থেকে সবার চেয়ে এগিয়ে ছিল। (ভিডিও ধারণকারী জিম্মাদার ভাইদের উদ্দেশ্যে-) দুই মিনিট বাকি আছে? ঠিক আছে আমি সংক্ষিপ্ত করছি। দ্রুত শেষ করছি।

তোরাবোরা ছিল ইসলামি ঐক্যের অন্যতম নিদর্শন। যেখানে কেবল একটি দেশ থেকে মুজাহিদরা আসেননি বরং বহু দেশ থেকে মুজাহিদ ভাইয়েরা এসে একত্রিত হয়েছিলেন। জাযিরাতুল আরব, ইয়ামান (তাঁরা সর্বযুগেই ইসলামকে সহযোগিতা করেছেন), কুয়েত, বাহরাইন, পবিত্র হারামাইন এবং মাগরিব আল ইসলামি থেকেও মুজাহিদ ভাইয়েরা এসেছেন। আমি এখানে শাইখ আবু জাফর আল-জাযায়িরি রহিমাহুল্লাহ'র কথা উল্লেখ করব এবং তাঁর সাথীদের কথাও উল্লেখ করব। যারা মরক্কো, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, পাকিস্তান, আফগান, শাম এবং তুর্কিস্তান থেকে এসে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই তোরাবোরাতে একত্রিত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে কবুল করে নেন, শহীদদের ওপর রহমত নাযিল করেন, বন্দিদেরকে মুক্ত করেন, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করেন।

ইনশাআল্লাহ আগামী হালাকাতে কথা হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلي الله علي سيدنا محمد واله وصحبه وسلم